উসূল আল-ফিকহ

ইসলামি আইন শাস্ত্রের মূলনীতি

শাহ্ আবদুল হান্নান

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

উসূল আল-ফিকহ: ইসলামি আইন শাস্ত্রের মূলনীতি
গ্রন্থস্বত্ব © বিআইআইটি পাবলিকেশন্স
প্রকাশকাল: মে ২০২০, বৈশাখ ১৪২৭, শাওয়াল ১৪৪১
বাড়ি # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা ১২৩০
ফোন: ০২-৫৮৯৫৭৫০৯, ০২-৫৮৯৫৪২৫৬, ০১৭৬৬ ০৭ ৩৩ ২১
ই-মেইল: biitpublications@gmail.com

মূল্য: ৯০.০০ টাকা

Usul Al-Fiqh: Islami Ayn Sasrer Mulniti
Written by Shah Abdul Hannan
Published by BIIT Publications
House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka-1230.
Phone: 02-58957509, 02-58954256, 01923 48 91 65
E-mail: biitpublications@gmail.com

ISBN: 978-984-94911-0-1

উসূল আল-ফিকহ কী ও কেন

প্রাথমিকভাবে বলা যায় *'উসূলুল ফিকহ'* (أصُول الفِقه) ইসলামি আইনের উৎস বা দলিল নিয়ে আলোচনা করে। অবশ্য *'নুরুল আনোয়ার'* গ্রন্থের লেখক শেখ আহমেদ ইবন আবু সাঈদ (যিনি *মোল্লাজিউন* নামে খ্যাত এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের গৃহশিক্ষক ছিলেন) উল্লেখ করেন যে, একদল আইনবিদের মতে *উসূলুল ফিকহ* ইসলামি আইন (*ফিকহ*) ও আইনের (*ফিকহের*) উৎস দুটো বিষয় নিয়েই আলোচনা করে।

উসূলুল ফিকহ [*উসূল* (أصُولٌ) হলো *আছল* (أصل)-এর বহুবচন] হলো ইসলামি আইনের ভিত্তি। এ শাস্ত্রের মাধ্যমে ইসলামি আইনের উৎস থেকে আইন প্রণয়নের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়। এ অর্থে *উসূল* হলো পদ্ধতি এবং *ফিকহ* হলো এর উপজাত বা ফল। সুতরাং *উসূলুল ফিকহ* হলো ইসলামি আইন বা *শরিআহ*র মূলনীতি (Principles of Islamic Jurisprudence)।

উসূলে ফিকহ ইসলামি আইনের প্রাথমিক উৎস কুরআন ও *সুন্নাহ* নিয়ে আলোচনা করে। অর্থাৎ *উসূল* কুরআন ও *সুন্নাহ*র বৈশিষ্ট্য নিয়ে পর্যালোচনা করে এবং কুরআন ও *সুন্নাহ* থেকে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি বর্ণনা করে। আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে *উসূল* কুরআন ও *সুন্নাহ*র বিভিন্ন শব্দ 'বিশেষভাবে' এবং আরবি ভাষা 'সাধারণভাবে' পর্যালোচনা করে থাকে।

'উসূলুল ফিকহ' (أصول الفقه) ইসলামি আইনের মাধ্যমিক উৎস নিয়েও পর্যালোচনা করে থাকে। যেমন-

ইজমা' (إجْماعٌ – সম্মতি);

কিয়াস (قِياس – সাদৃশ্যতার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ);

ইসতিহসান (إسْتِحْسان – আইনগত প্রাধান্য); এবং

'ইজতিহাদ (إجتِهاد – গবেষণা ও যুক্তির প্রয়োগ)।

আইন প্রণয়নের এসকল মাধ্যমিক উৎস অবশ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কুরআন ও *সুন্নাহ*র ওপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, *কিয়াস*'র তিনটি মূল উপাদান '*আছল*' (মূল ঘটনা), '*হুকুম*' (আছলের প্রেক্ষিতে রায়) এবং '*ইল্লাহ*' (কার্যকর কারণ) প্রাথমিক উৎসের ওপর নির্ভরশীল। '*উসূলুল ফিকহ*' ইসলামি আইন সংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি নিয়েও আলোচনা করে থাকে। যেমন আইনের ওপর প্রথার প্রভাব কিংবা আইনের উৎস হিসেবে প্রথার ভূমিকা।

এছাড়া গুরুত্বের দিক থেকে ইসলামি আইনের স্তর বিন্যাস হলো:

ফরয (فرض);

ওয়াজিব (واجب);

মান্দুব (مندوب);

হারাম (حرام); এবং

মাকরূহ (مكروه)।

উসূলের কতিপয় পুস্তকে বিস্তারিতভাবে আরবি ভাষার ব্যাকরণ আলোচিত হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে বলা চলে ইসলামি আইনবিদদের *(উসূলিউন)* জন্য আরবি ভাষার জ্ঞান ও ব্যাকরণ জানা অত্যাবশ্যকীয় তবে এটি উসূলের বিষয়বস্তু নয়।

উসূল পাঠ থেকেই আমরা জানতে পারি, কুরআন ও *সুন্নাহ*সহ সকল মাধ্যমিক উৎসের ব্যাখ্যা পদ্ধতি, বর্তমান ও অতীতকালের ইসলামি বিশেষজ্ঞদের *উসূল* বিষয়ে মনোভাব, *কিয়াস*'র মাধ্যমে প্রদত্ত রায়ের বিবরণ, '*ইজতিহাদ*-এর অন্যান্য পদ্ধতি, ইসলামি আইন এবং আইনবিষয়ক তাত্ত্বিক বিষয়াদির বিকাশ সংক্রান্ত ইতিহাস। *উসূল* পাঠের মাধ্যমে এসব বিষয়ে জ্ঞাত একজন ব্যক্তি ইসলামি আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সচেতন থাকবে। এ ব্যক্তি যেমন অতীতের আইনবিদদের রচিত পদ্ধতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল থাকবে তেমনি বর্তমানের নতুন বাস্তবতার আলোকে আইন প্রণয়ন ও ব্যাখ্যার ব্যাপারেও সচেতন হবে। সে তখন অসচেতন কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকবে। *উসূলুল ফিকহ*-এর মূল লক্ষ্য হলো '*ইজতিহাদ*কে নিয়ন্ত্রণ করা এবং আইনবিদদের আইনের উৎসসমূহ থেকে আইন প্রণয়নে পথ প্রদর্শন করা।

ইমাম শাফিঈকে *উসূলুল ফিকহ* বা *ফিকহ* জ্ঞানের জনক (প্রথম সংকলক) বলা যেতে পারে। কথাটি এ অর্থে সত্য যে, *উসূলুল ফিকহর* মূলনীতিগুলো ইমাম শাফিঈ প্রথমে প্রণালীবদ্ধভাবে বিন্যস্ত করেন। ইমাম শাফিঈর পূর্বের আইনবিদরা নীতির আলোকেই আইন প্রণয়ন করতেন- তবে

সে সকল নীতি একত্রিত এবং সুবিন্যস্ত ছিল না। ইমাম শাফিঈর পরে প্রচুর বিজ্ঞ ব্যক্তি *উসূল* পাঠের ব্যাপারে অবদান রেখেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আবুল হাসান আল বাসরি (ইন্তেকাল ৪৩৬ হি.), ইমাম আল হারামাইন আল জুয়াইনি (ইন্তেকাল ৪৮৭ হি.), আবু হামিদ আল গাজ্জালি (ইন্তেকাল ৫০৫ হি.), ফখরুদ্দিন আল রাজি (ইন্তেকাল ৬০৬ হি.), সাইফুদ্দিন আল আমিদি (عميدي), আবুল হাসান আল কারখি (ইন্তেকাল ৩৪৯ হি.), ফখরুদ্দিন আল বাজদাওয়ি (ইন্তেকাল ৪৮৩ হি.), আবু বাকার আল জাসসাস (ইন্তেকাল ৩৭০ হি.), সাদর আল শারিয়াহ (ইন্তেকাল ৭৪৭ হি.), তাজউদ্দিন আল সুবকি (ইন্তেকাল ৭৭১ হি.) এবং ইমাম আল শাতিবি (شطيبي) প্রমুখ।

প্রাথমিকভাবে *উসূল* পাঠের দুটো ধারা বিকাশ লাভ করে– তাত্ত্বিক ও আরোহী। তাত্ত্বিক পদ্ধতির বিকাশ ঘটে ইমাম শাফিঈর মাধ্যমে যিনি সুসংবদ্ধভাবে কতিপয় নীতি প্রণয়ন করেন এবং তার ভিত্তিতে *'ইজতিহাদ* করেন এবং *ফাতওয়া* দেন। অন্যদিকে প্রাথমিক হানাফী পণ্ডিতগণ কুরআন ও *সুন্নাহ*র ভিত্তিতে *ফাতওয়া* দেন এবং সে সব ফাতওয়ায় যেসব নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল তার ভিত্তিতে *উসূল* প্রণয়ন করেন। যাহোক, পরবর্তী স্কলারগণ দুটো ধারাকে সমন্বিত করেন এবং বর্তমানে এ সমন্বিত ধারা প্রচলিত রয়েছে ■

কুরআন

উসূলের কতিপয় পুরানো স্বীকৃত গ্রন্থে (যেমন শেখ আহমদ ইবন আবু সাঈদ রচিত *'নুরুল আনোয়ার'* বা শেখ আবুল বারাকাত ইবন আহমদ *নাসাফি* রচিত *'মানার'* গ্রন্থদ্বয়) উসূলের বেশিরভাগ অংশ হচ্ছে *'কিতাবুল্লাহ'* অর্থাৎ কুরআন শিরোনামের অধীনে। এ শিরোনামের অধীনে আলোচিত বিষয়সমূহ হলো– কুরআনের শব্দের শ্রেণিবিন্যাস (অথবা আরবি ভাষা), কুরআন ও *সুন্নাহ*র ব্যাখ্যার প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় আরবি ব্যাকরণ।

আলোচ্য গ্রন্থে কুরআন অধ্যায়ে আরবি ভাষা বা ব্যাকরণ আলোচিত হবে না। বরং কতিপয় আধুনিক *উসূল* বিশেষজ্ঞের আদলে 'ব্যাখ্যার পদ্ধতি' এ শিরোনামের অধীনে কুরআন ও হাদিসের শব্দ ব্যাখ্যা ও শ্রেণিবিন্যাসের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হবে। আগ্রহী পাঠকের প্রতি অনুরোধ রইল তারা যেন আরবি ভাষা ও ব্যাকরণ ভিন্নভাবে পাঠ করে নেন। আলোচ্য পরিচ্ছেদে কুরআনের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও এর ভূমিকা নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে।

কুরআন হলো এমন গ্রন্থ যা আল্লাহর বাণী হিসেবে রসুল মুহাম্মদ স.-এর নিকট নাজিল হয়েছে। কুরআনে মোট ১১৪টি অসম আয়তনের সুরা রয়েছে এবং সুরাগুলির সূচি বিষয়ানুসারে বিন্যস্ত নয়। আল্লাহর বাণী বা *ওহি* দুই প্রকার। যথা– *ওহি জাহির* এবং *ওহি বাতিন*।

ওহি জাহির (وحي ظاهر – প্রকাশ্য *ওহি*): কুরআন প্রকাশ্য *ওহির* (*ওহি জাহির*) সমষ্টি যা আল্লাহর ভাষায় মানুষের সাথে তার সরাসরি যোগাযোগ।

ওহি বাতিন (واحي باطن – অপ্রকাশ্য *ওহি*): *ওহি বাতিন* (অপ্রকাশ্য *ওহি*) *ওহি জাহির* থেকে ভিন্ন এ অর্থে যে *ওহি বাতিন* অনুপ্রেরণাভিত্তিক। রসুল স.-এর হাদিস *ওহি বাতিন* পর্যায়ভুক্ত।

হাদিসে কুদসি: যেখানে আল্লাহকে রসুল স. উদ্ধৃত করেছেন, যা কুরআনের পর্যায়ভুক্ত নয়, প্রকৃতপক্ষে এসকল হাদিসের সনদ (হাদিস বর্ণনাকারীদের আনুক্রমিক) যথার্থ কিনা তা যাচাই সাপেক্ষ বিষয়। যদি সনদ (আনুক্রমিক) দুর্বল থাকে তবে হাদিসটি দুর্বল বলে বিবেচিত হবে যদিও হাদিসটি হাদিসে কুদসি পর্যায়ভুক্ত হয়। এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রসুল স. হাদিসে কুদসি ও অন্যান্য হাদিসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন নি।

কুরআনের শুধু অর্থ (معني – *মা'না*) কিংবা শুধু পাঠ বা text (نظم – *নাজম*) কুরআন নয়। ইসলামি আইনবিদগণ এ ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন যে অর্থ ও পাঠের সমষ্টিই কুরআন।

কুরআন নাজিল হয়েছে ধাপে ধাপে (কুরআন, ১৭: ১০৬) এবং ধারাবাহিকভাবে (কুরআন, ২৫: ৩২)। *ওহির* ধারাবাহিক অবতরণ (نُزُول) *ওহিকে* হৃদয়ঙ্গম করতে ও মুখস্থ করতে সহায়তা করেছে। সকল ইসলামি বিশেষজ্ঞ সমগ্র কুরআনের বিশুদ্ধতার ব্যাপারেও ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

কুরআনের বৃহৎ অংশ নাজিল হয়েছে মক্কাতে (৩০ ভাগের প্রায় ১৯ ভাগ) এবং বাকি অংশ মদিনাতে। মক্কায় নাজিলকৃত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে এক আল্লাহতে বিশ্বাস, অবিশ্বাসীদের সাথে বিরোধ, সত্যের দিকে অবিশ্বাসীদের প্রতি আহ্বান ইত্যাদি বিষয়সমূহ। কিন্তু মদিনায় অবতীর্ণ সুরাসমূহে উপরোল্লিখিত বিষয়াদির অতিরিক্ত পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি, দেওয়ানি ও ফৌজদারি দণ্ডবিধি ইত্যাদি বিষয়ক আইনি ধারা আলোচিত হয়েছে। কোনো সুরা যদি প্রথমে মক্কায় নাজিল হয় এবং এর অন্যান্য আয়াতসমূহ পরবর্তীতে যদি মদিনাতেও নাজিল হয়ে থাকে সেই সুরাকে মক্কি সুরা বলা হবে। আর কোন সুরা মক্কি এবং কোনটি মাদানি তা নিরূপণ করা হয়েছে সাহাবি ও তাবেয়িনদের বর্ণনার প্রেক্ষিতে।

বিভিন্ন হিসাব থেকে দেখা যায়– কুরআনে প্রায় ৫০০টি আইন সংক্রান্ত বিষয়াদি বিবৃত হয়েছে। এসকল বিধিবিধান সংক্রান্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে ক্ষতিকারক প্রথা যেমন– শিশু হত্যা, সুদ, জুয়া, সীমাহীন বহুবিবাহ, ক্ষতিপূরণ, মৌলিক ইবাদতের ক্ষেত্রে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি প্রসঙ্গে। আরো বর্ণিত হয়েছে দান, শপথ, বিবাহ, তালাক, ইদ্দত, মোহর, ভরণপোষণ, শিশুর প্রতিপালন, দুধপান, পিতৃত্ব, উত্তরাধিকার এবং হেবা সংক্রান্ত বিষয়াদি। এছাড়াও আছে ব্যবসায়িক আদানপ্রদান যেমন– ক্রয়,

বিক্রয়, ধার, বন্ধক, ধনী-গরিবের মাঝে সম্পর্ক, ন্যায়বিচার, সাক্ষ্য, যুদ্ধ এবং শান্তি ইত্যাদি বিষয়।

যন্নী (ظني – অনুমানগত) এবং *কাত'ঈ* (قطعي – নিশ্চিত) দু'টি বিষয়ে *উসূল* পাঠে আলোচনা হয়। *কাত'ঈ* এবং *যন্নী* বিষয় দু'টো আলোচিত হয়েছে পাঠ (text) এবং পাঠের অর্থ বোঝাতে। কুরআনের সমস্ত পাঠই কাত'ঈ, অর্থাৎ কুরআনের বর্ণনা সন্দেহাতীত। কুরআনের বাইরে আর যে পাঠকে কাত'ঈর মর্যাদা দেয়া হয় তা হলো *মুতাওয়াতির* হাদিস এবং *সুন্নাহ*। অন্যান্য হাদিস এবং *'ইজতিহাদ যন্নী* পর্যায়ভুক্ত।

কাত'ঈ: কুরআনের যেসকল পাঠে সুস্পষ্ট শব্দে আল-*আলফায আল ওয়াদিহা* (الألفاظ الواضحة) বিবৃত হয়েছে এবং শব্দের একটি মাত্র অর্থ বহন করে এসকল পাঠকে অর্থগত দিক থেকেও কাত'ঈ বলে বিবেচনা করা হয়।

যন্নী: যা কাত'ঈর সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না তা-ই *যন্নী*। *কাত'ঈ* এবং *যন্নী*'র গুরুত্ব নির্ভর করে *আকিদা*গত বিষয়ের ক্ষেত্রে এবং আহকামগত বিষয়াবলির স্তরবিন্যাসে- *ফরয* (فرض), *ওয়াজিব* (واجب), *সুন্নাহ* (سنة), *হারাম* (حرام), *মাকরূহ* (مكروه) ইত্যাদি। *আকিদা* (عقيدة) বা বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াবলি নির্ধারিত হয় *কাত'ঈ* পাঠ ও *কাত'ঈ* অর্থের সমন্বয়ে। একজন ব্যক্তি *কাফের* বলে বিবেচিত হবে যদি সে কুরআনের কাত'ঈ পাঠকে অথবা *মুতাওয়াতির সুন্নাহ*কে অস্বীকার করেন, অন্যথায় নয়। একইভাবে *ফরয*ও নির্ধারিত হয় *কাত'ঈ* পাঠ ও পাঠের *কাত'ঈ* অর্থ সহকারে (দ্রষ্টব্য: পরিচ্ছেদ ১৭, ড. হাশিম কামালি, প্রিন্সিপলস অব ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স)।

কুরআনের অধিকাংশ পাঠ অর্থগত দিক থেকে *কাত'ঈ*। অর্থগত দিক থেকে *যন্নী* এ রকম শব্দের উদাহরণ সুরা আন নিসার (*বানাতুকুম*– তোমাদের কন্যারা) শব্দ (সুরা আন নিসা, ৪: ২৩) এবং সুরা আল মায়েদার (*ইয়ুনফাউ মিনাল আরদ*– পৃথিবী থেকে নির্বাসন) শব্দ। এসব শব্দ বা বাক্যাংশ স্বতঃই সুস্পষ্ট নয়, তাই এগুলি *যন্নী*।

কাত'ঈ ও *যন্নী'র* আলোচনায় কুরআন ও *সুন্নাহ* একে অপরের পরিপূরক। যে কোনো একটি *যন্নী* আয়াত কাত'ঈ বলে পরিগণিত হতে পারে অন্য যে কোনো একটি কাত'ঈ আয়াত বা কাত'ঈ *সুন্নাহ*র মাধ্যমে। একইভাবে *যন্নী সুন্নাহ* কাত'ঈ *সুন্নাহ*তে পরিগণিত হতে পারে অন্য কোনো কাত'ঈ আয়াত বা কাত'ঈ *সুন্নাহ*র সমর্থনে।

যতদূর সম্ভব কুরআনিক আইনের বৃহদংশ ব্যাপক আঙ্গিকে (Broader Outlines) প্রদান করা হয়েছে। বলা চলে খুব কম ক্ষেত্রেই কুরআন বিস্তারিতভাবে বিধিনিষেধ বর্ণনা করেছে। সুতরাং এ সংক্রান্ত অপর্যাপ্ততা দূর করতে এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই *সুন্নাহ* এবং *'ইজতিহাদ*-এর উপর নির্ভরশীল হতে হবে।

ভাববার বিষয় হলো, আহকামের কার্যকারণ (*তালিল*– تعليل) কি তা নিয়ে অনুসন্ধান করার কোনো এখতিয়ার আমাদের আছে কি না? অধিকাংশ *উসূল* বিশেষজ্ঞদের মত এ বিষয়ে শুধু হ্যাঁ বোধকই নয়, অধিকন্তু *'ইজতিহাদ*-এর মাধ্যমে ইসলামি আইনের আধুনিকায়ন অতীব জরুরিও বটে।

যাহোক, অল্প সংখ্যক বিশেষজ্ঞ মনে করেন *তা'লিল* অনুমোদিত নয় এবং একই যুক্তিতে *কিয়াস*ও সমর্থনীয় নয়। তবে এ ধারার মতটি দুর্বল এবং সম্ভবত তা'লিলের উদ্দেশ্য না বোঝার কারণেই এ ধারার সৃষ্টি হয়েছে। অন্য আরেকটি বিবেচ্য বিষয় হলো *আসবাব আল-নুযূল* (أسباب النزول)– আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট। কুরআনের কোনো আইন *আসবাব আল-নুযূল* দ্বারা সীমায়িত নয়। তবে *আসবাব আল-নুযূল* কুরআন ও এর আইন বুঝতে সহায়তা করে ■

সুন্নাহ

আরবি ভাষায় *সুন্নাহ* শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো পদচিহ্ন (beaten track) বা আচরণের প্রতিষ্ঠিত ধারা। ইসলামপূর্ব আরবরা *সুন্নাহ* শব্দ দ্বারা প্রাচীন অথবা প্রচলিত অনুশাসনকে বুঝাতো। হাদিসের আলেমদের মতে রসুল স. হতে বর্ণিত বক্তব্য, কর্ম এবং নীরব সম্মতি– এ তিনের সমষ্টিই হলো *সুন্নাহ*। *উসূল* বা আইনশাস্ত্রে আইনের উৎস হিসেবে *সুন্নাহ* শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। উদাহরণ হলো– রসুল স.-এর বিদায় হজ এবং মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়ামান পাঠানোর বর্ণনায়।

আইনতত্ত্বে *সুন্নাহ* শব্দটির সূচনা হয় হিজরি প্রথম শতকের শেষে। উল্লেখ করা দরকার যে দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধে ইমাম শাফিঈ *সুন্নাহ* শব্দটি রসুল স.-এর *সুন্নাহ*তে সীমায়িত করে দেন। *উসূলুল ফিকহ*তে *সুন্নাহ*কে *শরিআহ*র দ্বিতীয় উৎস হিসেবে বোঝানো হয়– কুরআনের পর যার স্থান। কিন্তু ফিকাহর উলেমাদের কাছে *সুন্নাহ* বলতে প্রাথমিকভাবে শরিয়তের সেই অংশকে বোঝায় যা অবশ্য করণীয় পর্যায়ভুক্ত নয়, তবে তা মান্দুব বা অনুমোদিত পর্যায়ভুক্ত। এ বিষয়ে হুকমে *শারঈ* অধ্যায় দেখুন। কিন্তু শরিয়তের উৎস হিসেবে *সুন্নাহ* কোনো কিছুকে *ওয়াজিব*, *হারাম* বা *মাকরুহ* বলে ঘোষণা করতে পারে। সাধারণ ব্যবহারে *সুন্নাহ* এবং হাদিস উভয় শব্দই রসুল স.-এর আচরণের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। *সুন্নাহ* কোনো কিছু প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রমাণ (*হুজ্জাহ*)। কুরআন সাক্ষ্য দেয় যে, *সুন্নাহ* আল্লাহর নিকট থেকে প্রেরণামূলক (কুরআন, ৫৩: ৩)। কুরআন রসুল স.-কে মানতে নির্দেশ করেছে (সুরা আন নিসা, ৪: ৫৯, ৮০; সুরা আল আহযাব, ৩৩: ৩৬; সুরা হাশর, ৫৯: ৭)। রসুল স.-কে বিচারক মানতে আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে আদেশ দিয়েছেন।

এক ধরনের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী *সুন্নাহ*কে তিনভাগে ভাগ করা যায়:

কাউলি (قولي)– মৌখিক উচ্চারণ;

ফেইলি (فعلي)– বাস্তব কর্ম; এবং

তাকরিরি (تقريري) – নীরব অনুমোদন।

বিধিগত এবং অবিধিগত *সুন্নাহ*– এ দু'ভাগেও এছাড়া *সুন্নাহ*কে ভাগ করা যায়।

বিধিগত *সুন্নাহ* বা *সুন্নাহ তাশরিইয়্যা* (سنة التشريعية) বলতে একজন নবি, শাসক ও বিচারক হিসেবে রসুল স. কর্তৃক সকল বক্তব্য ও কর্মের সমষ্টিকে বোঝায়।

অবিধিগত *সুন্নাহ* বা *সুন্নাহ গায়র তাশরিইয়্যা* (سنة غير تشريعية) হলো রসুল স.-এর খাদ্যাভ্যাস, নিদ্রাযাপন, পরিধেয় পোষাক-পরিচ্ছেদ এবং এরূপ অন্যান্য আচরণ যা শরিয়তের অংশ বলে বিবেচিত নয়।

'নূরুল আনোয়ার' নামক *উসূল* গ্রন্থে রসুল স.-এর এসব কার্যকলাপকে অভ্যাস (عدد – *আদত*) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু কিছু আচরণ অবশ্য দুটো অংশেই পড়ে বলে মনে হতে পারে। একজন যোগ্য বিশেষজ্ঞের পক্ষেই এ বিভাজন করা সম্ভব। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে চিকিৎসাবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা ইত্যাদি পেশাগত বিষয়ে বর্ণিত *সুন্নাহ শরিআহ*র অন্তর্ভুক্ত নয়। রসুল স.-এর সেসকল কথা ও কাজ যা বিশেষ অবস্থার সাথে সম্পর্কিত, যেমন- যুদ্ধকৌশল, শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করার কৌশল, আক্রমণের সময়সূচি, অবরোধ অথবা অবরোধ তুলে নেয়া– এসকল সাময়িক অবস্থাধীন বিষয়াবলি *শরিআহ*ভুক্ত নয়।

আরো কিছু বিষয় আছে যা শুধু রসুল স.-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন- তার স্ত্রীর সংখ্যা, মোহর ব্যতীত বিয়ে, রসুল স.-এর স্ত্রীদের পুনর্বিবাহে নিষেধাজ্ঞা। কুরআন ও *সুন্নাহ*র প্রকৃতিগত ভিন্নতা, *সুন্নাহ*র যথার্থতা এবং *সুন্নাহ* যেহেতু কুরআনের বিস্তৃত ব্যাখ্যা তাই *সুন্নাহ*র ওপর অবশ্যই কুরআনের প্রাধান্য থাকবে। যদি কখনো উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় তবে অবশ্যই কুরআন প্রাধান্য পাবে। কখনোই *সুন্নাহ*র অনুকূলে কুরআন বাতিল হবে না।

উল্লেখ করা দরকার যে, *সুন্নাহ* বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কুরআনকে সমর্থন করে। *সুন্নাহ* কুরআনের সালাত, জাকাত, হজ, সুদ, লেনদেন- এরূপ আরো অনেক বিষয়ে অধিকতর ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং স্পষ্টতর করে তোলে। *সুন্নাহ*র আরেকটি অংশ হলো ভিত্তিমূলক *সুন্নাহ* (سنة المؤسسة –*সুন্নাহ আল মুআস্সাসাহ*) অর্থাৎ যে বিধান *সুন্নাহ*তেই কেবল রয়েছে, যেমন- স্ত্রী ও তার

খালা বা ফুফুকে একত্রে বিবাহ করার নিষেধাজ্ঞা অথবা সম্পত্তির প্রাক ক্রয়ের অধিকার (*শুফা*) ইত্যাদির উল্লেখ কুরআনে পাওয়া যায় না। *সুন্নাহ* আল মুআস্সাসাহ কর্তৃক প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা ও তার অধিকারের দৃষ্টান্ত কুরআনে উল্লেখ ব্যতীত *সুন্নাহ*র ভিত্তিতেই হয়ে থাকে।

হাদিস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরা সংগৃহীত হাদিসকে গ্রন্থে স্থান দেবার পূর্বে সংগ্রহের সময়ই সকল হাদিসকে নিরীক্ষণ করে দেখেছেন হাদিসসমূহের ইসনাদ (*বর্ণনাসূত্র*) যথার্থ কি না এবং এ নিরীক্ষার ভিত্তিতে হাদিসসমূহকে- *সহিহ* (صحيح), *হাসান* (حسن), *যইফ* (ضعيف) বা দুর্বল এবং *মাওজু* (موضوع- বানোয়াট) এ চার ভাগে ভাগ করেছেন।

এখনো হাদিস শাস্ত্রের পুনঃনিরীক্ষা চলমান। বর্তমান শতকে নাসিরুদ্দিন আলবানি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। যারা আরবিতে পারদর্শী তারা আলবানির লিখিত গ্রন্থসমূহ দেখতে পারেন। এর বাইরেও এম এম আজমি রচিত *'স্টাডিজ ইন হাদিস মেথডলজি'* দেখতে পারেন।

মুতাওয়াতির (متواتر) হাদিস প্রায় ক্ষেত্রেই *কাত'ঈ* হিসেবে বিবেচিত হয় (متواتر بالمعني –*মুতাওয়াতির বিল মা'না*)।

কিছু হাদিস আছে যা অক্ষরে অক্ষরে *মুতাওয়াতির* হিসেবে বিবেচিত (متواتر باللفظ–*মুতাওয়াতির বিল লাফজ*)।

আরো উল্লেখ করা দরকার যে *মুতাওয়াতির* হাদিসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা অনেক হয়ে থাকে এবং অনেক সময় তারা বিভিন্ন লোকালয়ের অধিবাসী, তাই মিথ্যা উদ্ভাবনের সম্ভাবনাও কম। *মুতাওয়াতির* হাদিসের শর্তসমূহ হলো–

১. অসংখ্য বর্ণনাকারী থাকবে;
২. বর্ণনা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে হবে;
৩. বর্ণনা ভাষাগত দিক দিয়ে বা ইসলামের মৌলিকত্বের দিক দিয়ে যথাযথ হবে; এবং
৪. বর্ণনা সমকালীন গোত্রীয় ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হবে।

উসূলের অধিকাংশ উলেমাদের মতে *মুতাওয়াতির* হাদিসের কর্তৃত্ব কুরআনের সমতুল্য। *মুতাওয়াতির* হাদিস স্পষ্ট (কাত'ঈ) এবং এ হাদিসের অস্বীকৃতি কুরআন অস্বীকৃতির সমতুল্য।

মাশহুর হাদিস বলতে বোঝায় যে হাদিসের বর্ণনাকারী তিনজন বা ততোধিক তবে অসংখ্য নয়, কিন্তু পরবর্তীতে হাদিসটি বহুল আলোচিত হয়েছে। অধিকাংশ আলেমদের মতে *মাশহুর* হাদিস এক ধরনের *আহাদ* (أحد)

হাদিস এবং এ প্রকার হাদিস স্পষ্ট (*কাত'ঈ*) নয় বরং অনুমানমূলক (যা অকাট্য জ্ঞান প্রদান করে না)।

আহাদ হাদিস: অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন সাহাবা কর্তৃক এসব হাদিস বর্ণিত হয়েছে এবং দুই-তিন প্রজন্মের আগে হাদিসগুলো পরিচিতি পায় নি। অধিকাংশ আইনবিদের মতে যদি আহাদ হাদিস একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হয় তবে হাদিসটি আইনের ভিত্তি হতে পারে। কিছু আইন বিশারদ যদিও আহাদ হাদিসের ওপর ভিত্তি করে *শরিআহ* বিধান দানের ক্ষেত্রে মতামত দিয়েছেন, তবে *আকিদা* (ইমান) এবং *হদ* (حد–ইসলামের দণ্ডবিধি) আহাদ হাদিসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠতে পারে না। ইমাম মালিক এমন কোনো আহাদ হাদিসের ওপর আস্থা স্থাপন করেন নি যা মদিনার প্রতিষ্ঠিত প্রথার বিপরীত। অধিকাংশ আলেম মনে করেন না যে, আহাদ হাদিস হুবহু একজন থেকে অন্যজনের নিকট বর্ণিত হতে হবে। আহাদ হাদিসের আংশিকও বর্ণিত হতে পারে যদি বর্ণিত অংশ সামগ্রিক হাদিসটির সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।
যদি কোনো হাদিস বেশ কিছু বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত হয়, কারো বর্ণনাতে যদি অন্যদের চেয়ে অতিরিক্ত বর্ণনা সংযোজিত থাকে তখন আলোচনা করতে হবে যে হাদিসটি একই বৈঠকে উচ্চারিত হয়েছিল কি না? যদি তাই হয় তবে অধিকাংশ বর্ণনাকারীর বর্ণনায় যেটি এসেছে সেটিকেই গ্রহণ করতে হবে।
মুত্তাসিল (متصل –নিরবচ্ছিন্ন হাদিস) এবং *গাইর আল মুত্তাসিল* (غير المتصل–বিচ্ছিন্ন হাদিস):

***মুত্তাসিল* (متصل – নিরবচ্ছিন্ন):** *মুতাওয়াতির* (متواتر), *মাশহুর* (مشهور) এবং *আহাদ* (أحد) হাদিস যদি অবিচ্ছিন্নভাবে রসুল স. থেকে বর্ণিত হয় তাহলে তা মুত্তাসিল পর্যায়ভুক্ত।

***গাইর আল মুত্তাসিল* (متصل – বিচ্ছিন্ন) হাদিস:** *মুরসাল* (مرسل), *মুদাল* (معضل) এবং *মুনকাতঈ* (منقطع) *গাইর আল মুত্তাসিল* পর্যায়ভুক্ত হাদিস।
***মুরসাল* হাদিস:** অধিকাংশ আলেমদের মতে যে হাদিস সাহাবার নামোল্লেখ ব্যতীত একজন তাবেয়িনের মুখ হতে বর্ণিত হয়েছে তাই হলো *মুরসাল* হাদিস। অধিকাংশ আলেম মুরসাল হাদিসকে প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করেন নি। ইমাম আহমদ এবং ইমাম শাফিঈ মুরসাল হাদিসের উপর আস্থা স্থাপন করেন নি যদি

না হাদিসটি একজন বিখ্যাত তাবেয়ি কর্তৃক বর্ণিত না হয় এবং এ ক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্য হবে যদি কতিপয় শর্ত পালিত হয় (এসব শর্তের উল্লেখ উসূলের বইসমূহে আছে)। অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালিক অন্য দুই ইমামের চেয়ে মুরসাল হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে কম কঠোরতা অবলম্বন করেছেন।

***মুনকাতি* (منقطع) হাদিস:** যেসকল হাদিসের সনদে একজন বর্ণনাকারীর নাম অনুপস্থিত রয়েছে তাকে *মুনকাতি* (منقطع) হাদিস বলে।

***মুদাল* (معضل) হাদিস:** *মুদাল* (معضل) হাদিস হলো তাই, যে হাদিসের সনদে পরপর দুজন বর্ণনাকারীর নাম অনুপস্থিত।
হাদিসসমূহকে আবার সহিহ, হাসান এবং *যইফ* এ তিন ভাগেও ভাগ করা হয়েছে।

***সহিহ* (صحيح) হাদিস:** কোনো হাদিসকে সহিহ বলা যাবে (সহিহ এ অর্থে যে, হাদিসটি বর্ণনাকারী অত্যন্ত বিশ্বস্ত; এ অর্থে নয় যে হাদিসটি সর্বাত্মকভাবে সঠিক বা কাত'ঈ) যদি হাদিসটি অত্যন্ত বিশ্বস্ত (ثقة ثابت – *সিকাতুন সাবিতুন*) অথবা বিশ্বস্ত (ثابت– *সাবিতুন*) বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত হয়।

***হাসান* (حسن) হাদিস:** একটি হাদিস হাসান বলে গৃহীত হবে যদি বর্ণনাকারীদের মধ্যে কেউ সাদিক (সত্যবাদী), *সাদিক ইয়াহিম* (সত্যবাদী সত্ত্বেও ভুল করে) এবং *মাকবুল* (এমন ব্যক্তি যে অবিশ্বস্ত নয়)-এর নিচে না যায়।

***যইফ* (ضعيف) হাদিস:** একটি হাদিস যইফ (ضعيف حديث) বলে গৃহীত হবে যদি বর্ণনাকারীদের মধ্যে কেউ মাজহুল (مجهول– অপরিচিত) অথবা *ফাসিক* (তাকওয়ার ক্ষেত্রে উদাসীন) ব্যক্তি থাকে ■

কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা

উসূলুল ফিকহ (أصول الفقة)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো ইসলামের মৌলিক উৎস কুরআন ও *সুন্নাহ*কে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। কুরাআন এবং *সুন্নাহ*র পাঠ এবং পাঠের অর্থ বোঝার জন্যই এ ব্যাখ্যা কৌশল জানা দরকার। কোনো ব্যক্তি যদি কুরআন ও *সুন্নাহ*কে গভীরতরভাবে ব্যাখ্যা করতে চায় তবে তার আরবি ভাষার জ্ঞান প্রয়োজন। এজন্য *উসূলুল ফিকহ*র লেখকগণ *উসূলুল ফিকহ*র পাঠ্যসূচিতে শব্দের শ্রেণিবিভাগ সংযোজিত করেছেন।

পাঠ (text) স্বয়ং যদি প্রমাণ (*হুজ্জাহ*) হয়ে থাকে তবে সাধারণত ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নেয়া হয় না। যাহোক, *ফিকহ* অথবা আইনের বৃহদাংশ ব্যাখ্যার মাধ্যমেই রচনা করা হয়েছে। এটি উল্লেখ করা দরকার যে *তাবিল* (تأويل) এবং *তাফসির* (تفسير) এক বিষয় নয়।

***তাফসির* (تفسير):** তাফসিরের লক্ষ্য হলো প্রদত্ত পাঠের অর্থ ব্যাখ্যা করা এবং উক্ত পাঠের পরিসীমা থেকে আইনের ধারা বের করে অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ করা।

***তাবিল* (تأويل):** তাবিলের লক্ষ্য হলো পাঠের শাব্দিক অর্থের বাইরে যেয়ে এবং লুক্কায়িত অর্থ বের করার চেষ্টা করা, যা প্রায়ই অনুমানকৃত যুক্তি এবং *'ইজতিহাদ*-এর উপর নির্ভরশীল।

পাঠের প্রত্যেকটি শব্দের প্রকৃত (مطلق – *মুতলাক*), সাধারণ (عام – *আম*) এবং শাব্দিক অর্থ সাধারণত গ্রহণ করা হয়।

***তাফসির তাশরিঈ* :** যদি কুরআন বা *সুন্নাহ*র একাংশের ব্যাখ্যা (تأويل – *তাবিল*) কুরআন বা *সুন্নাহ*র অন্য অংশ দ্বারা প্রদান করা হয় তবে একে

তাফসির তাশরিঈ বলে এবং এ ব্যাখ্যাকৃত অংশকে অপরিবর্তনীয় আইনের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে যদি *তাফসির* অথবা *তাবিল* মতামত বা *'ইজতিহাদ'*র (إجتهاد) রূপ নেয় তবে এ ব্যাখ্যাসমূহকে *যন্নী* বিবেচনা করা হয় এবং এর দ্বারা কখনো কিছু *ওয়াজিব* হয় না।

আলফাজ-ওয়াহিদা-স্পষ্ট শব্দ *(*ألفاظ واضحة*)*:
দ্ব্যর্থহীন শব্দসমূহকে চার শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। শ্রেণি চারটি হলো–
জাহির (ظاهر);
নাস (نص);
মুফাস্সার (مفسر); এবং
মুহ্কাম (محكم)।

***জাহির* (ظاهر):** *জাহির* হলো সেই ধরনের শব্দ যার অর্থ স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন, তথাপিও তাবিলের জন্য উন্মুক্ত কেন না এসকল শব্দের অর্থ প্রসঙ্গের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

***নাস* (نص):** *নাস* হলো দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট শব্দ এবং প্রসঙ্গের সাথে সামঞ্জস্যশীল। এটিও তাবিলের জন্য উন্মুক্ত।
জাহির (ظاهر)আর *নাস* (نص)শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ভর করে উল্লিখিত শব্দটির অর্থ প্রসঙ্গের সাথে সামঞ্জস্যশীল কি-না কিংবা শব্দটির অর্থ মুখ্য না গৌণ তার ওপর। *জাহির* আর *নাস* শব্দসমূহের স্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করতে হবে। *ফিকহ* শাস্ত্রে *'নাস'* শব্দটির পূর্ব আলোচিত অর্থের বাইরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়, যার অর্থ কুরআন এবং *সুন্নাহ*র নির্দিষ্ট পাঠ (text)। এখানে অবশ্য এ অর্থে *'নাস'* শব্দটি ব্যবহৃত হয় নি।

***মুফাস্সার* (مفسر) এবং *মুহকাম* (محكم):** *মুফাস্সার* (দ্ব্যর্থহীন) এবং *মুহকাম* (প্রাঞ্জল) শব্দ বলতে সেসব শব্দসমূহকে বোঝায় যা সার্বিকভাবে স্পষ্ট এবং এক্ষেত্রে তাবিলের আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় না। জাহির আর *নাস* শব্দসমূহের সাথে মুফাস্সার আর মুহকাম শব্দদ্বয়ের পার্থক্য এখানেই। স্পষ্টতার দিক থেকে মুফাস্সার আর মুহকাম শব্দদ্বয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তবে আইনবিদরা শব্দদ্বয়ের মধ্যে ভিন্নতা আরোপ করেছেন *নাসখ* (نسخ)-এর প্রেক্ষিতে। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Abrogation বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন

কিংবা সংযোজন-বিয়োজন। আইনবিদদের মতে মুহকাম *নাসখ*যোগ্য নয়, আর মুফাস্সার *নাসখ*যোগ্য। তবে এ পার্থক্যের খুব একটা প্রায়োগিকতা নেই। কেন না এখন নতুন করে আর *নাসখে*র অবকাশ নেই।

অস্পষ্ট শব্দ

অস্পষ্ট শব্দ (الفاظ غير واضحة – *আলফাজ গাইর ওয়াদিহাহ*) চার শ্রেণিভুক্ত। যথা:

খফি (خَفِى – দুর্বোধ্য);
মুশকিল (مشكل – আয়াসসাধ্য);
মুজমাল (مجمل – সংক্ষিপ্ত অর্থবোধক); এবং
মুতাশাবিহ (متشابه – জটিল ও প্রচ্ছন্ন)।

***খফি* (خَفِى):** খাফির উদাহরণ হলো *সারিকা* (سرقة – চুরি) শব্দটি আংশিকভাবে স্পষ্ট নয় বা দুর্বোধ্য, কেননা 'পকেটমার' চুরির পর্যায়ভুক্ত কি না তা বোধগম্য নয়, কিন্তু এটি জানা অত্যন্ত জরুরি। যদি 'পকেটমার' চুরির অন্তর্ভুক্ত না হয় (এটিই অধিকাংশ আইনবিদদের মত) তবে 'পকেটমার' হদের (কুরআন এবং *সুন্নাহ* বর্ণিত দণ্ডবিধি আইন) সম্মুখিন না হয়ে তাযিরের (আইন প্রয়োগকারীদের দ্বারা প্রণীত আইন) সম্মুখিন হবে।

মুশকিল (مشكل): মুশকিল শব্দের একাধিক অর্থ থাকে। তাই পাঠ্যের প্রকৃত অর্থ নিরূপণের জন্য *'ইজতিহাদ* (اجتهاد) ও *তাবিলের* (تأويل) শরণাপন্ন হতে হয় (এক্ষেত্রে একাধিক মতামত থাকতে পারে)। মুশকিল সহজাতভাবে দ্ব্যর্থক শব্দ।

***মুজমাল* (مجمل):** *মুজমাল* সেসকল শব্দ ও পাঠকে নির্দেশ করে যা সহজাতভাবে অস্বচ্ছ এবং কোনটি সঠিক অর্থ সে ব্যাপারে কোনো নির্দেশনাও দেয় না। মুজমাল শব্দের নানাবিধ অর্থ থাকতে পারে অথবা এটি একটি অপরিচিত শব্দ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ সালাত, হজ, রিবা এবং সিয়াম শব্দসমূহের উল্লেখ করা যেতে পারে। এ শব্দসমূহ তাদের শাব্দিক অর্থ না বুঝিয়ে পরবর্তীতে টেকনিক্যাল বা শরঈ অর্থ গ্রহণ করেছে। যাহোক, এ শব্দসমূহ পুরোপুরি পরিষ্কার (مُفَسَّر – *মুফাস্সার*) রূপ পরিগ্রহ করেছে, যেহেতু এ ব্যাপারে *সুন্নাহ*তে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। ১০১ নং সুরার ১-৫ নং আয়াতে উল্লিখিত *'আল-কারিয়াহ'* (القارعة) শব্দটি মুজমাল শব্দের উদাহরণ।

শব্দটি কুরআন কর্তৃক ব্যাখ্যাত, ফলে তা স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে। যদি শব্দটির পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা আল্লাহ কর্তৃক প্রদান করা না হতো তবে মুজমাল শব্দটি মুশকিল বলে বিবেচিত হতো এবং *'ইজতিহাদ* ও তাবিলের জন্য শব্দটি উন্মুক্ত থাকত।

মুতা*শাবিহ* (متشابه – জটিল ও প্রচ্ছন্ন)

মুতা*শাবিহ* (জটিল) হলো এমন শব্দ যার অর্থ রহস্যময়। আল-*হরুফুল মুকাত্তা'আত* (الحروف المقطعات) যথা –'আলিফ-লাম-মিম' হলো মুতা*শাবিহাত* শব্দসমূহের উদাহরণ। কেউই এসব শব্দের অর্থ জানে না। অনেক বিশেষজ্ঞ কুরআনের যেসকল আয়াতে মানুষের সাথে আল্লাহর সাদৃশ্য আনা হয়েছে সেসকল আয়াতকে মুতা*শাবিহ* পর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচনা করেছেন। আবার কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে *আল-হরুফুল মুকাত্তা'য়াত* শব্দ ব্যতীত আর কোনো শব্দ মুতা*শাবিহ* পর্যায়ভুক্ত নয়। আইন রচিত হয় এমন পাঠে মুতা*শাবিহ* শব্দ নেই।

শব্দের একপ্রকার ভাগ হচ্ছে *আ'ম* এবং *খাস*। ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দসমূহকে *আ'ম* এবং *খাস* দু'ভাগে বিন্যাস করা যায়।

***আ'ম* (عام – সাধারণ):** আ'ম হচ্ছে সেসকল শব্দ যার একটি মাত্র অর্থ থাকে এবং যা অনেক সংখ্যার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। পরিমাণ সংখ্যা দ্বারা এ ব্যবহার সীমায়িত নয় এবং যেসকল বিষয়ে শব্দটি প্রযোজ্য তার সকলকেই শব্দটি ধারণ করে। আ'মপর্যায়ভুক্ত শব্দের উদাহরণ হলো *ইনসান* (إنسان)– বাংলায় মানুষ। যখন আরবিতে *আল* (أل) আর্টিকেলটি কোনো বিশেষ্য পদের পূর্বে ব্যবহৃত হয় তখন বিশেষ্য পদটি *আ'ম* বলে বিবেচিত হয়। আরবি ভাষায় *জামি* (جميع – সকল), *কাফ্ফা* (كافة– সকল), কুল্লু (كل – সকল) শব্দত্রয় যদি অন্য কোনো শব্দসমূহের পূর্বে বা পরে ব্যবহৃত হয় তখন তা *আ'ম* বলে পরিগণিত হয়। উদাহরণস্বরূপ একটি হাদিসের উল্লেখ করা যেতে পারে; যেমন

لاضرر ولاضرر في الإسلام– ইসলামে কষ্ট দেয়া এবং কষ্ট গ্রহণ নেই। যখন কোনো আদেশ *আ'ম* শব্দের ব্যবহারযোগে করা হয় তখন আদেশটি প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রেই আরোপিত হবে। আমের ক্ষেত্র নির্ধারণের জন্য শুধু ভাষার ব্যাকরণের দিকে খেয়াল রাখলেই চলবে না বরং বাস্তবিক ক্ষেত্রে মানুষের ব্যবহারের দিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং যদি কখনো ব্যাকরণ রীতি ও